বিশ্বখ্যাত ফোর্ড মোটরগাড়ি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা
হেনরি ফোর্ড-এর সাড়া জাগানো বই

সিক্রেটস অব জায়োনিজম

(বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির)

ভাষান্তর ॥ ফুয়াদ আল আজাদ

সিক্রেটস অব জায়োনিজম

(বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির)

হেনরি ফোর্ড

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

এক সন্ধ্যায় ছেলেটা অফিসে এলো। সুদর্শন তরুণ, চেহারায় একটা মায়ামাখা দ্যুতি। কথা বলছেন খুবই বিনয়ী কণ্ঠে। নাম ফুয়াদ। পড়েন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কয়েক মিনিটেই টের পেয়েছিলাম—এই ছেলের মাথায় বিশেষ কিছু আছে।

আমতা আমতা করে বলল– 'আমি একটা বই অনুবাদ করেছি, *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স*-কে দেখাতে চাই।' নীলক্ষেত থেকে সবুজ কভারে অনুবাদ গ্রন্থটি বাঁধাই করে নিয়ে এসেছিল ফুয়াদ। ওপরে লেখা-'The International Jew'। স্বাগত জানিয়ে বললাম– এখনই বইটি দেখা একটু কঠিন; আপনি কি বইটি সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন, প্লিজ?'

খানিক সময় নিয়ে ফুয়াদ ভাই শুরু করলেন। বিশ্বখ্যাত গাড়ি কোম্পানি ফোর্ড এবং তার মালিক হেনরি ফোর্ড সম্পর্কে প্রথমে বললেন। এরপর ফোর্ড কেন বইটি লিখলেন, তা জানালেন। কীভাবে বইটি আমেরিকার বুক মার্কেট থেকে হাওয়া হয়ে গেল, ৫৫ বছর পরে আবার প্রকাশিত হলো, তা জানলাম।

ফুয়াদ ভাইয়ের ৩০ মিনিটের ভূমিকা শুনে 'থ' বনে গেলাম। কী বলে এই তরুণ! জায়োনিজমের বিরুদ্ধে কত-শত মানুষ বলছে, লিখছে; এমন কথা তো কখনো কোথাও শুনিনি! হুংকার শুনি, প্রতিহতের ডাক শুনি, ষড়যন্ত্রতত্ত্ব শুনি, কিন্তু জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম কখনোই এভাবে কোথাও থেকে বুঝিনি। ভাবনার জগতে হারিয়ে গেলাম। জায়োনিস্টরা তাহলে এভাবে ফাংশন করে! না জানি কখন আমরাও তাদের শিকারে পরিণত হই!

সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—আমরা এই অনুবাদগ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবো। কাজ শুরু হলো। বইটি প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে ফুয়াদ ভাইয়ের কাছে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তিন-তিনবার পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছি। নতুন করে কাজ করে নিয়েছি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অনুবাদক কাজ করে দিয়েছেন, উদ্যম হারাননি। পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার পর এক বছর পর্যন্ত প্রকাশনা সংস্থার অফিসে এলেও যে তরুণের মুখে হাসি লেগেই থাকে, তাকে কী বলে ধন্যবাদ দেওয়া যায়?

আলহামদুলিল্লাহ! ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এর বইমেলায় আসছে *সিক্রেটস অব জায়োনিজম : বিশ্বব্যাপী জায়োনিস্ট ষড়যন্ত্রের ভেতর-বাহির*। মূল ইংরেজি বই চার খণ্ডের, আমরা বাংলাভাষায় এক খণ্ডেই প্রকাশ করছি। মূল বইয়ের ৮০ পর্ব থেকে কিছু পর্ব বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ, সেসব আলোচনা একান্তই আমেরিকার সমাজ ও নাগরিকদের জন্য বিশেষায়িত। বইয়ের কলেবর না বাড়ানোর

একটা প্রচেষ্টা ছিল। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে কিছু কলামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা হয়েছে। ভিন্ন আলোচনার টপিক নিয়ে আমরা অধ্যায়ের নামকরণ করেছি। ১৯২০ সালে লেখা এই বইয়ে যেসব ডাটা ছিল, তার হালনাগাদ তথ্য রেফারেন্সসহ সংযুক্ত করা হয়েছে। অনুবাদক যেসব কথা যুক্ত করেছেন, তা বক্স আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন পাঠকবৃন্দ সহজেই পার্থক্য খুঁজে নিতে পারেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটা দারুণ গ্রন্থ এখন আপনাদের হাতে। আপনি অবাক চোখে জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম পড়বেন, শিহরিত হবেন, আঁতকে উঠবেন। আগামী দিনের পৃথিবীকে যারা নেতৃত্ব দিতে চান, অবশ্যই তাদের এই গ্রন্থে একবার চোখ বুলিয়ে যাওয়া উচিত। আপনার চারপাশের সচেতন মানুষদের জায়োনিস্ট ম্যাকানিজম নিয়ে সতর্ক করবেন– প্রত্যাশা এটাই।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

অনুবাদকের কথা

কেন ইহুদিদের নিয়ে বিশ্বজুড়ে এত আলোচনা-সমালোচনা? প্রশ্নটি একই সাথে জটিল ও সহজ। আপনারা নিশ্চয় সবাই একমত হবেন, আন্তর্জাতিক বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান এই আলোচনাতেই নিহিত। তাদের নিয়ে মানবতাবাদী বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও কৌতূহলীদের গবেষণার অন্ত নেই। কীভাবে হাজার বছরের একটি জাতি আজকের দুনিয়াতে প্রতাপশালী ভূমিকায় আবির্ভূত হলো, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য, এই অনুসন্ধানে ইহুদিদের পক্ষ হতে তেমন কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তাদের ব্যাপারে অপ্রীতিকর কিছু প্রকাশ পাক, এমনটি তারা কখনোই চায় না; হোক তা সত্য বা মিথ্যা। তাদের আকাঙ্ক্ষা– সাধারণ মানুষ সেভাবেই তাদের ইতিহাস জানুক, যেমনটা তারা চায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকাস্ট এমনই একটি উদাহরণ।

অনেকে বলে এবং স্বয়ং ইহুদিরাও দাবি করে, তাদের পেছনে অদৃশ্য একটি শক্তির আশীর্বাদ রয়েছে; যার কল্যাণে বহু নিপীড়ন সহ্য করেও তারা আজ ক্ষমতাধর জাতিতে পরিণত হয়েছে। হেনরি ফোর্ড তাঁর *The International Jews* বইয়ে উপস্থান করেছেন– কী সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ!

ইহুদিদের বলা হয় প্রোপাগান্ডা মেশিন। এই মেশিন তারা দুই কাজে ব্যবহার করে। প্রথমত, নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে। দ্বিতীয়ত, অন্যদের দ্বারা প্রচারিত যেকোনো মতবাদের বিরুদ্ধে। এই প্রোপাগান্ডা মেশিনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল হেনরি ফোর্ডকেও।

প্রথম দিকে ১৯১৯ সালের মে মাস হতে *The Dearborn Independent* পত্রিকার মাধ্যমে তিনি নিয়মিত ইহুদিদের বিতর্কিত বিষয়ের ওপর আর্টিকেল প্রকাশ করতেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি থেকে তাঁর প্রতিটি আর্টিকেল ৯ লাখ কপি পর্যন্ত বিক্রি হতো। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তা পঠিত হতো। ইহুদিরা এ পর্যায়ে প্রোপাগান্ডা মেশিন নিয়ে মাঠে নেমে পরে। সত্যি বলতে বিশ্ব গণমাধ্যমের একটি বড়ো অংশ তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাদেরই নিয়ন্ত্রণে রয়ে গেছে। তারা দাবি করে, অবান্তর ও ভিত্তিহীন তথ্যের মাধ্যমে হেনরি ফোর্ড সাধারণ মানুষের মনে এন্টি-সেমিটিক ক্ষোভ উসকে দিচ্ছে। একসময় মি. ফোর্ড থেমে যেতে বাধ্য হন। বইটিসহ তাঁর পত্রিকা প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু বইটি সাধারণ মানুষের মনে যে দীর্ঘকালব্যাপী ইহুদিবিরোধী চেতনার দাগ কেটে গেছে, তা মুছে দিতে এই প্রোপাগান্ডা মেশিনকে আরও বহু বছর চলমান রাখতে হয়।

এ বইয়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো– Protocols of the Elders of Zion। ইহুদিরা আজও এটিকে জার সাম্রাজ্য কর্তৃক ইহুদিবিরোধী প্রচারণার অংশ বলে দাবি করে থাকে। কিন্তু প্রটোকলগুলোতে যা দাবি করা হয়েছে, তার সত্যতা কতটুকু? তার জবাব একবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটের সাথে তুলনা করলেই পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও চলচ্চিত্রশিল্প, ক্রীড়াশিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতি, মাদকশিল্প ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তাদের যে আধিপত্য, তার প্রারম্ভ যেভাবে হয়েছে– তা বিস্তারিত এই বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। বইটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ১০০ বছর পর পুনরায় ভিন্ন একটি ভাষায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তবে সময়ের প্রয়োজনে মূল আলোচনার পাশাপাশি বিগত দশকগুলোতে ঘটে যাওয়া প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে।

একটা কথা বলে রাখছি। পুরো ইহুদি জাতিগোষ্ঠীকে হেয় করা কখনোই এ বইটির উদ্দেশ্য ছিল না। তখনকার মতো এখনও অনেক বিখ্যাত ও কম-বিখ্যাত ইহুদি খুঁজে পাওয়া যাবে, যারা মানবাধিকারের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে; এমনকী তারা নব্য ইজরাইল রাষ্ট্রেরও বিরুদ্ধে। বইটির অধিকাংশ স্থানে যে ইহুদি জাতিয়তাবোধ ও চেতনার কথা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জায়োনিজমকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু মূল বইয়ের বেশিরভাগ স্থানে 'ইহুদি' শব্দটি উল্লেখ থাকায় এখানেও তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

আরেকটি বিষয় বলে রাখা ভালো– বইয়ের কলেবর ছোটো রাখা ও সুখপাঠ্য করার স্বার্থে মূল বইয়ের চার খণ্ডের পরিবর্তে তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে মাত্র একটি খণ্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাথে সাথে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার জন্য কিছু কিছু স্থানে নতুন তথ্য উৎসসহ সংযোজন করা হয়েছে। তবে যেকোনো ভুলকেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ থাকল। অতিরঞ্জিত হলে তা জানানোর অনুরোধ করছি, যেন পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জিত আকারে পেশ করা যায়।

আশা করি বইটির অনূদিত সংস্করণটি পাঠকদের নিকট কিছু ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি মনোরঞ্জনেরও কাজ করবে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মনে এ বইটি ইহুদি বিতর্কের বিভিন্ন দ্বার উন্মোচনে সাহায্য করবে।

ফুয়াদ আল আজাদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ জানুয়ারি, ২০২০

ভূমিকা

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল। ইউরোপজুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া বইতে শুরু করে। ২৮ জুন, ১৯১৪, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী Archduke Franz Ferdinand সার্বিয়ান আততায়ীর হাতে নিহত হলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর হাঙ্গেরি যখন সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ইউরোপ দুই ভাগ হয়ে যায়। একপক্ষ জার্মানি-হাঙ্গেরি-অস্ট্রিয়া-অটোমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি এবং অপর পক্ষ রাশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স-সার্বিয়ানদের মিত্রশক্তি। তখন জার্মানদের দাপটে মিত্রশক্তির খাবি খাওয়া অবস্থা।

তারা যে প্রযুক্তির সাবমেরিন নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে আসে, তা ছিল সেই যুগের বিস্ময়। ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীকে তারা তুড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দেয়। একদিকে, অভ্যন্তরীণ সেনা বিদ্রোহের আশঙ্কায় ফ্রান্স তখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। একই সময় রাশিয়ার আকাশে জমতে শুরু করে বলশেভিক বিপ্লবের কালো মেঘ। এমনিতেই জার সম্রাট কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এমন সব তরুণদের পাঠিয়েছিলেন, যাদের ছিল না কোনো সামরিক প্রশিক্ষণ। ফলে বস্তাপঁচা লাশ হয়ে দেশে ফিরে আসে তারা। শুরু থেকেই মিত্রশক্তির ছিল তাল-মাতাল অবস্থা।

অপরদিকে, ১৯১৬ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত জার্মানির অভ্যন্তরে একটি গুলি পর্যন্ত ফোটেনি। তারা যেন হেসে-খেলে যুদ্ধে জিতে যাচ্ছিল। ব্রিটেনকে শান্তি আলোচনায় আসার প্রস্তাব দেয় তারা। ব্রিটেনও ভাবছিল, একা একা এই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কারণ, তখন তার মিত্রশক্তিরা নিজ দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সামলাতে ব্যস্ত। ব্রিটেন শান্তি আলোচনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে।

কিন্তু জার্মান জায়োনিস্টরা ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীকে আশ্বস্ত করে, তারা চাইলে এখনও যুদ্ধে বিজয় লাভ করা সম্ভব। শান্তি-চুক্তিতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা আমেরিকাকে এই যুদ্ধে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তবে এর বিনিময়ে তাদের হাতে প্যালেস্টাইনের চাবি তুলে দিতে হবে। কোনো উপায় না দেখে ব্রিটেন এই শর্তে রাজি হয়ে যায়। এরপর আমেরিকা তাদের রণতরি নিয়ে এগোতে শুরু করে। যুদ্ধের মোড় এখানেই পালটে যায়। পরবর্তী ছয় মাসের মাথায় কেন্দ্রীয় শক্তি পরাজিত হয়।

সাধারণ আমেরিকানদের মনে জার্মানবিরোধী চেতনা জাগিয়ে তুলতে সেখানকার ইহুদি মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো একের পর এক মিথ্যা সংবাদ প্রচার শুরু করে। যেমন : জার্মানি একটি সন্ত্রাসী দেশ, তারা হান দস্যু, তারা রেডক্রসের নার্সদের বুকে গুলি ছোড়ে, নাবালক শিশুদের হত্যা

করে ইত্যাদি ইত্যাদি। মুহূর্তে যেন আমেরিকার সাধারণ জনগণ জার্মানদের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। যুদ্ধ শেষে শুরু হয় নতুন প্রচারণা। যেমন : জার্মানিতে ইহুদিরা মানবেতর জীবনযাপন করছে, সেখানে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে, তাদের ওপর সাধারণ মানুষ যুদ্ধের ঝাল মেটাচ্ছে, তারা আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর সাহায্যের আশায় বসে আছে এবং সবাই যেন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

এ নিয়ে ১৯১৯ সালে প্যারিসে শান্তি আলোচনার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল ১১৭ জন ইহুদি প্রতিনিধি, যাদের অনেকেই জার্মান নাগরিক। আলোচনার এক পর্যায়ে তারা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্যালেস্টাইন দাবি করে। জার্মান সম্রাট তখন মাথায় হাত দিয়ে বলেন– 'এই কি ছিল যুদ্ধের কারণ?' তিনি বুঝতে পারলেন, রাশিয়া থেকে বিতাড়িত একদল বিশ্বাসঘাতককে নিজ দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্রিটেন থেকে আসে বেলফোর ঘোষণা।

'... A Jewish Defector Warns America (1961) '

Benjamin Freedman

ইহুদিরা পৃথিবীর প্রাচীন একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। তাদের রয়েছে প্রায় তিন হাজার বছরের ইতিহাস। তবে এই ইতিহাস যতটা না ধর্মকেন্দ্রিক, তার চেয়ে বেশি জাত ও বংশকেন্দ্রিক। জনসংখ্যায় অতি নগণ্য হয়েও আধিপত্য ও সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের দিক থেকে তারা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তাদের প্রসঙ্গ সামনে এলেই যেন বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিমের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। এর পেছনে রয়েছে ঐতিহাসিক নানা দ্বৈরথ, গত কয়েকশো বছরের অসংখ্য ষড়যন্ত্র এবং প্যালেস্টাইনের ওপর চলমান নির্যাতন। যারা ছিল একসময়কার সবচেয়ে নিপীড়িত জাতি, তারাই আজ পৌঁছে গেছে নিপীড়কের নেতৃত্বে। সেই ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে তাদের যে উত্থান শুরু হয়েছে, তার ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। যে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের মতো দেশগুলো একসময় ইহুদিদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত, তারাই আজ তাদের অধিকার ও নিরাপত্তার দায়িত্বে কাজ করছে। কিন্তু তাদের এই উত্থান কীভাবে ঘটল? কীভাবে তারা আজকের ক্ষমতাধর জাতিতে পরিণত হলো? কোন সে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে তারা শাসন করে যাচ্ছে পুরো বিশ্বকে?

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পরে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের উন্মাদনা। নতুন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় শিল্প-কারখানগুলোর চিত্র পালটে যেতে শুরু করে। পরিবর্তনের হাওয়ায় বদলে যায় বিশ্ব অর্থনীতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনপ্রবাহ। সে সময় পৃথিবী লক্ষ করে নতুন এক শক্তির আবির্ভাব– 'জায়োনিজম'। বলে রাখা ভালো, জায়োনিজম পৃথিবীর বহু প্রাচীন একটি মতবাদ। তবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের স্বপ্নে ১৮৯৭ সালে Theodor Herzl ও Max Nordau-এর হাত ধরে এই মতবাদটি একটি সাংগঠনিক রূপ পায়; 'World Zionist

Organization'। নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলে কীভাবে তারা বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছে, তা অল্প কথায় এই অংশে কখনো উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

ইহুদিরাই তো পুঁজিবাদ এবং আধুনিক ব্যাংকিং শিল্পের জন্মদাতা। সুদভিত্তিক অর্থ-বাণিজ্যকে কাজে লাগিয়ে তারা সুকৌশলে কেড়ে নিয়েছে জ্যান্টাইল সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। শেয়ারবাজারগুলোতে তাদের সংঘবদ্ধ দৌরাত্ম্য কত বিনিয়োগকারীকে যে পথের ফকির বানিয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। বিশ্ব শ্রমবাজার তাদের কণ্টকময় থাবায় জর্জরিত। লোহা, ইস্পাত, তামা, কপার, নিকেল ও স্বর্ণ-রৌপের খনিগুলো নিজেদের কবজায় নিয়ে কাঁচামাল শিল্পের ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য সৃষ্টি করেছে। জনমত নিয়ন্ত্রণে চারদিকে গড়ে তুলেছে অসংখ্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠান। চারদিকে বিপ্লব, আন্দোলন এবং বিভাজনের বীজ ছড়িয়ে দিতে সুকৌশলে মানুষের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভয়ংকর সব মতবাদ। চলচ্চিত্র ও শিল্পকলায় অশ্লীলতার সংযোজন ঘটিয়ে যুব সমাজের নৈতিকতাবোধ ধ্বংস করে ফেলেছে। সেইসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় ঢুকিয়ে দিয়েছে নাস্তিকতার বীজ।

হেনরি ফোর্ড ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম ধনী ব্যবসায়ী; ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। শিল্প বিপ্লবের সেই সময়টিতে অন্যদের মতো তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন– অদৃশ্য সেই শক্তি তার প্রতিষ্ঠানেও থাবা বসাতে চাইছে। কিছু করতে না পারলে তার ভাগ্যেও অন্যদের মতো দেউলিয়ার থালা ঝুলবে। ব্যবসায় কার্যক্রমের পাশাপাশি তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও পরিচালনা করতেন, যার নাম ছিল– *The Dearborn Independent*।

তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এই অদৃশ্য শক্তির মুখোশ বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচন করেই ছাড়বেন। সে সময় একজন আমেরিকান হয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুখ খোলা যেনতেন কাজ ছিল না। বইটি পড়লেই এর কারণ জানতে পারবেন।

১৯২০ সাল থেকে তিনি ইহুদিদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের ওপর একের পর এক তথ্যপূর্ণ আর্টিকেল প্রকাশ করা শুরু করেন। এর ফলে তার পত্রিকার জনপ্রিয়তা খুব দ্রুতই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পরে। সর্বত্র এটি নিয়মিত পঠিত হতে শুরু করে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়া সেরা ৮০টি আর্টিক্যাল নিয়ে তিনি একটি বই প্রকাশ করেন– *The International Jews*।

বইটি খুব দ্রুতই ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন এমনিতে জার্মান ও রাশিয়ানরা ইহুদিদের ওপর ক্ষেপে আছে, তার ওপর প্যালেস্টাইন ইস্যু তো রয়েছেই। এমতাবস্থায় এই বইটি সাধারণ মানুষকে যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারে, তা

তারা ভালো করেই আঁচ করতে পেরেছিল। সত্যের মতো এমন কোনো আধুনিক অস্ত্র নেই, যা সাধারণ মানুষকে এক করতে পারে। এ কারণে ইহুদিরা সত্যকে এত বেশি ভয় পায়।

শত ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার পরও যখন ইহুদিরা বইটি বন্ধ করতে পারছিল না, তখন আমেরিকান প্রশাসন এবং প্রেসিডেন্ট-এর বিশেষ ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ১৯২৭ সালে ফোর্ড-এর বই ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান সিলগালা করে দেয়। তারপর থেকে সর্বত্র এর প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়। মুদ্রিত যে কপিগুলো তখনও পৃথিবীর বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পড়ে ছিল, সেগুলো ধ্বংস করে দেয়। ফোর্ড-এর ওপর প্রশাসনিক বল প্রয়োগ করা হয়, যেন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিছুদিন পর তার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি ফলাও করে চারদিকে প্রচার করা হয়। সাথে এও যোগ করা হয়– এই বইয়ের অধিকাংশ বিষয় ছিল মনগড়া, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে তারা কিছুটা হলেও জনমনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এরপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। ১৯৪০ সালে Gerald L.K. Smith ফোর্ড-এর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। ততদিনে তার মোটর গাড়ির জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী তুঙ্গে। আলোচনার এক পর্যায়ে বইটির প্রসঙ্গ চলে এলে ফোর্ড বলেন, তিনি বইটি প্রকাশের জন্য কখনোই ক্ষমা চাননি। Mr. Smith এ কথা শুনে প্রচণ্ড অবাক হন! তিনি বলেন– 'তাহলে সে সময় আপনার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি যে চারদিকে ফলাও করে প্রচার করা হয়!' উত্তরে ফোর্ড সাহেব বলেন– 'সব মিথ্যা, আমি কখনো ক্ষমা চাইনি। আমার কর্মচারী Harry Bennett সেই ক্ষমাপত্রে দস্তখত করেছিল, আমি নই। আমি এই বইটি আবারও প্রকাশ করতে চাই, তবে তা আদৌ সম্ভব হবে কি না জানি না।'

এই হলো বইটির প্রেক্ষাপট। বইটির অধিকাংশ কপি বাজার থেকে গায়েব করে দেওয়া হলেও তারপরও কিছু কপি সাধারণ মানুষের কাছে ছিল। তাদের উত্তরসূরিগণ পরবর্তী সময়ে বইটির ডিজিটাল ভার্সন অনলাইনে আপলোড করে বলেই বইটি পুনরায় পাঠকদের কাছে ফিরে এসেছে। যারা বিশ্বে নানান ভাষায় বইটি অনূদিত হয়েছে। কোটি মানুষ বইটি পড়ছে। বাংলা ভাষায় বইটি পড়তে আপনাকে স্বাগতম।

সূচিপত্র

ইহুদি ইতিহাস	১৫
ইহুদি বিতর্ক : সত্য না কল্পকাহিনি	২৯
আন্তর্জাতিক ইহুদি ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব	৪৬
প্রকাশনা শিল্পে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র	৭৮
বলশেভিক বিপ্লব এবং ইহুদি ষড়যন্ত্র	৮৮
জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় : ইহুদি জালিয়াতি	১১২
শিল্প সংস্কৃতি : ইহুদি ছোবল	১৩২
অর্থ : ইহুদি ক্ষমতার মূল উৎস	১৭৫
জায়োনিস্টরাই কি আর্মাগেডনের জন্ম দেবে	১৮৯
দাঙ্গাবাজ ইহুদিদের অপকর্মের চিত্র	২০০
আমেরিকার অর্থব্যবস্থায় ইহুদি দৌরাত্ম্য	২১৫
ইহুদি ঔদ্ধত্যপনা	২৩৬
ইহুদি সমাজে ঘেটো ব্যবস্থা	২৬২
জ্যান্টাইলদের প্রতি ইহুদি দৃষ্টিভঙ্গি	২৮৫

'ইহুদিদের ব্যতিক্রমধর্মী বেশকিছু নৈতিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন : কঠোর শারীরিক শ্রমের প্রতি অনীহা, সন্তান উৎপাদনে অধিক আগ্রহী, তীব্র ধর্মীয় প্রেরণা, দৃঢ় পারিবারিক বন্ধন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার অসাধারণ ক্ষমতা, সমবেত উপায়ে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখার সক্ষমতা, যুদ্ধের মাঠে জীবন দেওয়ার অসীম সহাসিকতার অধিকারী, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় উপায়ে শোষণধর্মী মানসিকতা, অর্থনৈতিক বিষয়ে নিজেদের ফটকা পরিকল্পনাসমূহ অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, প্রাচ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, সামাজিক প্রতিপত্তি নিয়ে অন্যদের ওপর অহংকার প্রদর্শন এবং সাধারণের চেয়ে উচ্চতর মেধাশক্তির অধিকারী হওয়া।' -*The New International Encyclopedia*

ইহুদি ইতিহাস

ইহুদিদের আবির্ভাব মানব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাদের নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহল কোনো যুগেই কম ছিল না। আজকের আধুনিক বিশ্ব যেসব খুঁটির (অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি) ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রতিটির পেছনেই রয়েছে ইহুদিদের অদৃশ্য আধিপত্য। জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হয়ে এক টুকরো নিরাপদ ভূমির খোঁজে তারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছে যাযাবরের মতো।

পেরিয়ে গেছে প্রায় ২০০০ বছর। নির্যাতন-নিপীড়ন এখন তাদের জন্য নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। এ নির্যাতন ভোগের পেছনে তাদের প্রতি যে অন্যান্য সম্প্রদায়দের অ্যান্টিসেমেটিক[১] মনোভাব ছিল, তা বলা যায় না। কারণ, নিজেদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা আজ পর্যন্ত যত কৌশল উদ্ভাবন করেছে, তার অধিকাংশই সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধুসুলভ ছিল না। পৃথক জাতীয়তাবাদ নীতি ও অসাধু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরুন তারা বারংবার বিতর্কিত জাতিতে পরিণত হয়েছে।

রাশিয়ায় ইহুদিরাই ছিল বলশেভিক[২] বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে তারা জবাই করেছে লাখো তাজা প্রাণ। সেই বিপ্লবের যারা খলনায়ক, তারাই আজ আমাদের চোখে মহানায়ক। জার্মান সাম্রাজ্য পতনের পেছনেও তারা সবচেয়ে বড়ো প্রভাবক ছিল। তারা বিষাক্ত অণুজীব হয়ে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। এক এক করে দখল করে সেখানকার প্রতিটি শিল্প ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে তারা ইংল্যান্ডকে বানিয়েছে হাতের পুতুল। স্বর্ণ-রৌপ্যের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ চুরি করে নিজেদের প্রাচুর্যতাকে করেছে পাহাড়সম। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে রক্তক্ষয়ী অন্তঃকোন্দলে জড়িয়ে হাসিল করেছে নিজেদের ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। প্রবীণ ও তরুণ ইহুদিরা নিজেদের প্রাচুর্যতা ও উচ্চাভিলাসী মনোভাব কাজে লাগিয়ে আমেরিকাকে একটি যুদ্ধবাজ দেশে পরিণত করেছে, যা আজ তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হাসিলের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার। যেকোনো সরকারের শাসনামলে তাদের জন্য একটি সুবিধাজনক পদ বিশেষভাবে বরাদ্দ রাখা হয়। হোয়াইট হাউজেও রয়েছে তাদের অবাধ

---

১. অ্যান্টি-সেমেটিক– ইহুদি বিদ্বেষী মনোভাব

২. বলশেভিক বিপ্লব– বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে এই বিপ্লবের সূচনা হয়, যার হাত ধরে কমিউনিস্ট সোভিয়েতের জন্ম হয়।

প্রবেশাধিকার। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে বিষাক্ত মতবাদ ঢুকিয়ে দিতে ইহুদি রাবাইদের[৩] যেন পরিশ্রমের শেষ নেই। তারা বলে– 'আশীর্বাদ চাইলে ইজরাইল যাও। কারণ, আমরাই সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত সম্প্রদায়।'

জনসংখ্যায় এত অল্প হয়েও তারা যেভাবে নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করেছে, তা ইতঃপূর্বে অন্য কোনো জাতি পারেনি। পুরোনো ছেঁড়া কাপড় সংগ্রহ করে তা বিক্রি করা থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির সবকিছু আজ তারা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অধিক পরিশ্রমী পদে কাজ করার ব্যাপারে তাদের রয়েছে তীব্র অনীহা। উৎপাদন ও যন্ত্রপাতি পরিচালনার মতো ঝুঁকিপূর্ণ পদগুলোতে সাধারণত জ্যান্টাইলদের[৪] ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে সেলসম্যান, ম্যানেজার এবং ক্লার্কের মতো সহজ পদগুলো তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। প্রাচীন প্রুশিয়ানদের[৫] এক সমীক্ষা অনুযায়ী– তাদের মোট জনসংখ্যা ছিল ২৬৯৪০০ জন। এর মাত্র ছয় শতাংশ অর্থাৎ ১৬১৬৪ জন ছিল ইহুদি, যার মধ্যে ১২০০০ জনই ছিল ব্যবসায়ী এবং ৪১৬৪ জন শ্রমিক। অন্যদিকে ৯৬ শতাংশ জ্যান্টাইল অর্থাৎ ২৫৩২৩৬ জনের মধ্যে মাত্র ১৭০০০ জন ব্যবসায়ী।

বর্তমান প্রেক্ষাপট অবশ্য ইতিহাস থেকে অনেক ভিন্ন। ব্যাবসা-বাণিজ্যের উঁচু পদগুলোতে আজ জ্যান্টাইলদের উপস্থিতি পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে তাদের সংখ্যা যে হ্রাস পেয়েছে তা নয়; Jews Encyclopedia অনুযায়ী– বর্তমানে বিশ্বের বৃহদাকার প্রায় সকল বিপণিবিতান তারাই পরিচালনা করছে। ট্রাস্ট, ব্যাংক, কৃষি ও খনিজ সম্পদের মতো আরও অনেক শিল্প রয়েছে, যা তাদের কবজাধীন হয়ে পড়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান এখনও জ্যান্টাইলদের মালিকানায় রয়েছে, তার পেছনেও ইহুদিদের বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী কাজ করছে। প্রকাশনী শিল্পে তারা কতটা ক্ষমতাধর, তা সামনের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে। থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতে তাদের দ্বিতীয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

জার্মান লেখক Werner Sombart তার বই *Jews and Modern Capitalism*-এ উল্লেখ করেন–

> 'যদি আমেরিকার অভিবাসন হার প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর জন্মহার এবং উন্নয়নসূচক একই ধারায় চলতে থাকে, তবে আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছর পর এ দেশ হবে নিগ্রো, ক্রিতদাস ও ইহুদিদের দেশ; যেখানে তারাই হবে ক্ষমতাধর জনগোষ্ঠী।'

আলোচনার গভীরে যাওয়ার আগে দুটি বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান রাখা উচিত।

---

৩. রাবাই–ইহুদিদের ধর্মীয় গুরু।

৪. জ্যান্টাইল–ইহুদি নন পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়কে জ্যান্টাইল বলা হয়।

৫. প্রুশিয়ান–প্রাচীন এক ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র, যা জার্মানিসহ কয়েকটি দেশের সাথে মিশে গেছে।

প্রথমত : পৃথিবীর সব ইহুদিই সম্পদশালী নয়; তাদের মাঝেও ধনী-গরিব শ্রেণি আছে। তবে গরিব শ্রেণির দরিদ্র্যতার মূল কারণ– তাদের সম্পদশালী জ্ঞাতি ভাইয়েরা। মূলত কৌশলগত কারণেই তারা নিজেদের মাঝে এই শ্রেণি-পার্থক্যের জন্ম দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত : শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তারা নিজেদের ঐক্য ও জাতীয়তায় বিভাজন তৈরি করেনি। ফলে কৃতিত্ব ও সফলতা অর্জনের দিক দিয়ে অন্য কোনো সম্প্রদায় কখনোই তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। আজকের আমেরিকা তো তারাই তৈরি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসন ও ক্ষমতার লড়াই নিয়ে পুরো পৃথিবী যখন ক্ষত-বিক্ষত, তখন অসংখ্য মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আমেরিকায় অভিবাসী হয়। আর এই সুযোগ লুফে নিয়ে ইহুদিরাও দলে দলে আমেরিকায় প্রবেশ করা শুরু করে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর যেখানে একমাত্র অবলম্বন ছিল মেধা ও পরিশ্রম, সেখানে তাদের অবলম্বন অঢেল অর্থ-সম্পদ। তারা জন্ম দেয় পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার। শুরু হয় শ্রমবাজারের সাথে পুঁজিবাজারের দ্বন্দ্ব। নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুঁজিপতিরা কিনে নিতে থাকে সাধারণ মানুষের মেধা ও শ্রম।

একটা সময় ছিল– যখন তারা শুধু কৃষি কাজ করত। রোমান সম্রাট কর্তৃক জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাই ছিল তাদের মূল পেশা। তাহলে কীভাবে তাদের আমূল পরিবর্তন হলো, আর কীভাবেই-বা উত্থান ঘটল?

আসলে Formative Period (১০০০ BC-৫০০ AD)-এর বিশেষ একটি শাসনব্যবস্থা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে। অর্থনৈতিক কাঠামো ন্যায়সংগত করতে পয়গম্বর মোজেস[৬] 'Money aristocracy' আইনটির প্রচলন করেন। সুদ-বাণিজ্য এবং ঋণী ব্যক্তির জমি দখল করাকে তিনি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। তার আইনে চিরস্থায়ী আয়েশি জীবনের কোনো স্থান ছিল না। তিনি দখলদারদের হাত থেকে আত্মসাৎ হওয়া সকল জমি উদ্ধার করে জনসাধারণের মাঝে বণ্টন করেন। এ আইন ৫০ বছর স্থায়ী ছিল; যাকে বলা হয় 'The Year of Jubilee'।

কিন্তু এমন আইন মেনে চললে তো আর রাজকীয় সম্পদের মালিক হওয়া যাবে না। তাই মোজেস মারা যাওয়ার কিছুদিন পর তারা আবারও সুদ-বাণিজ্যে ফিরে আসে। মূলত, মুনাফার প্রশ্নে তারা কখনো আপস করতে রাজি ছিল না। তাই মোজেসের যেসব আইন অধিক মুনাফা অর্জনে প্রতিবন্ধক, সেগুলোর প্রতিটি তারা পালটে দেয়। 'Law of Stranger' নামে তারা নতুন একটি আইন তৈরি করে। এ আইন অনুযায়ী অন্যান্য সম্প্রদায়দের সাথে বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হতো। যেমন : একজন অপরিচিত জ্যান্টাইলের সাথে সুদ-বাণিজ্য করা যাবে, কিন্তু নিজ ধর্মের ভাইয়ের ওপর কখনোই সুদের বোঝা চাপানো যাবে না।

---

৬. মোজেস–নবি মুসা (আ.)

ইতিহাস বলে, ইজরাইল সব সময় একটি শাষকরাষ্ট্র হতে চেয়েছে। তারা চেয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি রাজ্য তাদের কুর্নিশ করবে এবং তারাই হবে সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না! জ্যাকব[৭] থেকে শুরু করে সকল পয়গম্বর চেয়েছিলেন– ইজরাইল পৃথিবীর বুকে একটি ন্যায়পরায়ণ জাতি হিসেবে টিকে থাকবে। ওল্ড টেস্টামেন্টও ঠিক একই কথা বলে। তাহলে কেন তাদের এই অধঃপতন। তা কীভাবেই-বা ঘটল? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের ফিরে যেতে হবে ক্যানানাইটদের[৮] যুগে।

আজ থেকে আনুমানিক ৩৯০০/৪০০০ বছর পূর্বে ইজরাইল, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান নীলনদের পূর্বাঞ্চলীয় অনেকটা অংশ জুড়ে ছিল ক্যানানাইটদের রাজত্ব। সে সময় পয়গম্বর আব্রাহামকে[৯] মেসোপটেমিয়ার কোনো এক স্থানে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। সৃষ্টিকর্তা তাকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করে ক্যানান ভূমিতে নিয়ে আসেন। আব্রাহাম যখন মেসোপটেমিয়ায় ছিলেন, তখনই সৃষ্টিকর্তা তাঁর সাথে একটি সন্ধি করেন। বলা যেতে পারে এটা ইজরাইল জাতির মূল সূচনালগ্ন। আব্রামের নিরানব্বই বছর বয়সে প্রভু তাকে দেখা দিলেন এবং বললেন–

> 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাথে গমন করে পরিশুদ্ধ হও। আমি তোমার সাথে আপন নিয়ম স্থির করব এবং তোমার বংশকে অতিশয় বৃদ্ধি করব।'

আব্রাম তখন ভূমিষ্ট হয়ে পড়েন। ঈশ্বর বললেন–

> 'দেখ, আমি তোমার সাথে এই সন্ধি করছি, তুমি হবে বহু জাতির পিতা। তোমার নাম আর আব্রাম (মহাপিতা) থাকবে না; বরং হবে আব্রাহাম (বহুলোকের পিতা)। কারণ, তোমাকে বহু জাতির পিতা বানালাম। ...এই সমগ্র ক্যানান দেশকে আমি তোমাকে এবং তোমার ভাবী বংশধরদের চিরস্থায়ী অধিকারার্থে প্রদান করব, আর আমি হব তাদের ঈশ্বর।' Genesis. 17:1-8

তারও অনেক আগে– সৃষ্টিকর্তা ঠিক এ রকমই একটি সন্ধি করেছিলেন পয়গম্বর নোয়াহের[১০] সাথে। পার্থক্য হলো– পয়গম্বর আব্রাহামের বংশধরদের যেখানে ক্যানানাইট ভূমির অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে পয়গম্বর নোয়াহের বংশধরদের সমগ্র বিশ্বের কর্তৃত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

ক্যানানাইটরা হলো নোয়াহের কনিষ্ঠ পুত্র হ্যামের বংশধর। নোয়াহ সৃষ্টিকর্তার সাথে সন্ধি করেছিলেন– তার বংশধররা কেবল তারই উপাসনা করবে এবং তার প্রণীত সকল আইনকানুন মেনে চলবে। কিন্তু সেই সন্তানেরা একসময় একেশ্বারবাদের কথা ভুলে গিয়ে পৌত্তলিকতায় মেতে

---

৭. জ্যাকব– নবি ইয়াকুব (আ.)

৮. ক্যানাইটদের– বাইবেলে উল্লিখিত এক অভিশপ্ত জাতি।

৯. আব্রাহাম–পয়গম্বর ইবরাহিম (আ.)

১০. নোয়াহ– পয়গম্বর নুহ (আ.)

ওঠে। তারা ঈশ্বরের আইন অগ্রাহ্য করে নিজেদের মতো আইন রচনা এবং বিভিন্ন ভাস্কর্যের উপাসনা করতে শুরু করে। যেমন : আনাথ– যুদ্ধ-বিগ্রহের কুমারী দেবী, আথিরাত– সমুদ্র পরিভ্রমণকারী, আত্তার– প্রভাতের দেবতা ইত্যাদি। তাদের এই পেগানবাদ[১১] ততদিনে ক্যানানসহ অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও আরও অনেক পাপকর্মের দরুন তারা একসময় সৃষ্টিকর্তার অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়।

অপরদিকে পয়গম্বর আব্রাহামের বংশধরদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তাঁর পৌত্র জ্যাকবের অপর নাম ইসরাইল। এই নাম অনুযায়ী তাঁর ১২ পুত্র এবং তাদের বংশধরদের একত্রে বনি ইসরাইল বলা হয়। সৃষ্টিকর্তার সহায়তায় ফেরাউনের রাজত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে জেরুজালেমে ফিরে আসার পর তাদের নিকট ঐশী বাণী আসে, তারা যেন ক্যানানাইটদের সেখান থেকে বের করে দেয়।

কিন্তু তারা এই নির্দেশ অমান্য করে। তারা এই অভিশপ্ত জাতির সম্পদ ও প্রাচুর্যের মোহে পড়ে যায়। এমন একটি জাতিকে নির্বাসিত করে তারা সম্পদের মহাসমুদ্র হাতছাড়া করতে চায়নি। অবাধ্যতার সূচনা এখান থেকে শুরু। ধীরে ধীরে তারা ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বস্তুবাদী বিশ্বাসে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বর্গীয় নির্দেশ অমান্য করার দরুন তাদের ওপর যে শাস্তি নেমে আসে, তা বহুকাল বয়ে বেড়াতে হয়। অনেকের ধারণা– এই ক্যানানাইটরাই আজকের ইহুদিদের সকল ক্ষমতা ও প্রাচুর্যতার মূল কারণ।

যাযাবর হলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রদূত হিসেবে তারা যে পুরো পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে, তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক। একসময় চায়নাতে তাদের একটি জনগোষ্ঠী ছিল। সেক্সনদের[১২] সময় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তারা দলবলে ইংল্যান্ডে হাজির হয়। পিলগ্রিম ফাদাররা[১৩] দক্ষিণ আমরিকার প্লেমাউথ শিলায় আসার শত বছর আগ থেকে তাদের বণিকরা সেখানে রমরমা বাণিজ্য করত। ১৪৯২ সালে সেন্ট থমাস দ্বীপে তারা প্রথম চিনি কারখানা গড়ে তোলে। ব্রাজিলেও ছিল তাদের আফিম বাণিজ্য। তারা যে পৃথিবীর কোথাও চষে বেড়ানোর বাকি রাখেনি, তা ছোট্ট একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব; জর্জিয়াতে প্রথম যে সাদা বর্ণের শিশুটি জন্ম নেয়, সেও ছিল একজন ইহুদি– Isaac Minis।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিত্যনতুন কৌশল এবং উপকরণ উদ্ভাবনের প্রতিভা– সব যুগেই তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে সাহায্য করেছে। আজকের দিনেও ব্যবসায়িক লেনদেনে এমন অনেক জিনিসের ব্যবহার হচ্ছে, যার প্রকৃত আবিষ্কারক তাদের-ই কোনো না কোনো সদস্য।

---

১১. পেগান–ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম ব্যতীত সব ধর্মকে পেগান বলা হয় এ ছাড়াও যারা মূর্তি ও প্রকৃতির উপাসনাকারী, তাদেরকেও এ নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

১২. সেক্সন–ইউরোপিয়ান এক প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী, যারা আজ বিভিন্ন জাতিতে ছড়িয়ে পরেছে।

১৩. পিলগ্রিম ফাদার–ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রথমে যে ইংলিশ নাগরিকগণ আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে, তাদের পিলগ্রিম ফাদার বলা হয়।

যেমন : পৃথিবীর প্রাচীনতম বিল অব এক্সচেইঞ্জের আবিষ্কারক হলো– Simon Rubens। তা ছাড়া কাগজের নোট, ব্যাংক নোট, বিভাগীয় বিপণিবিতান, দ্বৈত্ব করব্যবস্থা ইত্যাদি তাদেরই আবিষ্কার।

'Payable to Bearer (বাহককে প্রদেয়)' নিয়ে মজার একটি গল্প আছে। সাধারণত ধনী ব্যবসায়ীদের শত্রুর অভাব হয় না। এ কারণে ইহুদিদের শত্রুর অভাব ছিল না। কেউ যেন তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে না পারে, সে জন্য তারা সম্পদের পরিমাণ বা মালিকানা কখনো প্রকাশ করত না; বরং একজন বাহক-এর নামে এর মালিকানা গোপন রাখত। সে সময় তাদের সম্পদ জব্দ করা জলদস্যুদের জন্য বৈধ ছিল। তারা পণ্যের ওপর নিজেদের নাম না লিখে 'Bearer bill' ব্যবহার করত। তাই বোঝার কোনো উপায় থাকত না, কোনটা তাদের পণ্য আর কোনটা জ্যান্টাইলদের। তখন ব্যবসায়িক লেনদেনে ব্যক্তি-বিশেষকে জামানত হিসেবে ব্যবহার করা হতো, কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাণিজ্যের চেয়ে পণ্যকেন্দ্রিক বাণিজ্যকে তারা অধিক গুরুত্ব দিত। কারণ, অর্থ পরিশোধের পূর্বে যদি ক্রেতা সাহেবের মৃত্যু হয়, তবে বিক্রেতা কখনো সে অর্থ দাবি করতে পারবে না, কিন্তু পণ্যকেন্দ্রিক বাণিজ্যে ক্রেতা সাহেব মারা গেলেও বিক্রেতা অন্তত তার পণ্য দাবি করতে পারবে। নতুন এই পদ্ধতি ব্যবসায় জগৎকে অনেক নির্দয় করে তোলে। কারণ, তখন মানুষ ব্যক্তি-বিশেষের চেয়ে পণ্য-সম্পদ রক্ষায় অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আজকের যে পুঁজিবাদ অর্থব্যবস্থা, তার জন্মদাতা তো তারাই! তবে নিজেদের এ কীর্তি গোপন রাখতে 'জ্যান্টাইল ফ্রন্ট' নামে তারা নতুন এক কৌশল উদ্ভাবন করে। অর্থাৎ মুখোশ হিসেবে জ্যান্টাইলদের ব্যবহার করে, যেন ভেতরের মানুষটাকে কেউ চিনতে না পারে। এ জন্য বিপণিবিতান, ব্যাংকিং কোম্পানি, সংগীতের দোকান, থিয়েটার হল ও মদের দোকানগুলোতে নিয়োজিত কর্মীদের অধিকাংশই খ্রিষ্টান, মুসলিম বা পেগানদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে। কিন্তু পেছন থেকে যে এগুলোর কলকাঠি কোনো ইহুদি বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী নাড়ছে, তা অনেকের পক্ষেই বোঝা অসম্ভব।

যে স্টক একচেঞ্জ শিল্পকে কেন্দ্র করে আজ প্রতিটি দেশ বড়ো বড়ো পুঁজিবাজার গড়ে তুলছে, তাও তাদের প্রতিভার আরেকটি বহিঃপ্রকাশ। বার্লিন, প্যারিস, লন্ডন, ফ্রাঙ্কফুট ও হাম্বার্গারের প্রথম সব স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রকগোষ্ঠী তারাই। ভেনিস ও জেনওয়াককে তো বলাই হতো ইহুদিদের শহর। আধুনিক ব্যাংকিং শিল্পের প্রথম ভিত্তি প্রস্তর সেখানেই গড়ে ওঠে। তা ছাড়া ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ব্যাংক অব আমস্টারডাম, ব্যাংক অব হাম্বার্গ, ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম ইত্যাদি তাদেরই পরিকল্পনায় গড়ে উঠে, যা আজও টিকে আছে।

তারা পৃথিবীর যেখানে গিয়েছে, সেখানেই পুরো অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। একসময় স্পেন ছিল স্বর্ণ বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের বের করে দিলে স্পেনের অর্থনীতি এমনভাবে ভেঙে পড়ে, যা আজও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিভাগের ছাত্ররা

প্রায়ই একটা বিষয় ভেবে খুব অবাক হয়– বিশ্ব বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু কেন বারবার পরিবর্তিত হয়েছে?

জ্যান্টাইলদের রক্ত যেন ইহুদিদের মাঝে প্রবেশ করতে না পারে, তাই বিয়ে-শাদির ব্যাপারে তাদের রয়েছে বিশেষ আইন। মধ্যযুগীয় বিভিন্ন দলিল থেকে জানা যায়– তাদের সংগ্রহে এমন অনেক তথ্য থাকত, যা তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের কাছেও থাকত না। দূরদর্শী ক্ষমতার দিক দিয়ে তাদের সমতুল্য পৃথিবীতে আর কোনো জাতি ছিল না। ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা তারা পূর্বেই অনুমান করতে পারত। পরবর্তী সময়ে তা নিউজ লেটার আকারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করত। রাজ্য পরিচালনায় আগাম তথ্য যে কতটা মূল্যবান, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তাই এই অমূল্য তথ্যের প্রধান জোগানদাতা হিসেবে তারা সব সময়-ই কাজ করত; তা গুপ্তচর বৃত্তি করে হোক বা অন্য যেকোনো উপায়ে-ই হোক। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যক্তিদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা ছিল তাদের আরেকটি কৌশল।

এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে তারা প্রতিটি রাষ্ট্রে ঋণ ব্যবস্থার এজেন্ট বনে যায়। গড়ে তোলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক। প্রতিটি রাষ্ট্রে তাদের কিছু এজেন্ট থাকত, যারা সেখানকার আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখত। প্রয়োজনে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বড়ো অঙ্কের ঋণ দেওয়ার এখতিয়ার পর্যন্ত তাদের ছিল। তাদের বলা হতো 'Court Jew'। পরে এই ঋণ প্রতিটি রাজা-বাদশার ওপর বিশাল অঙ্কের দায় হিসেবে চেপে বসত। তারা কখনো রাশিয়ান জনগণকে নিয়ে ভাবত না; বরং ভাবত কীভাবে রাশিয়ার সরকারকে কবজায় আনা যায়। একই পরিকল্পনা করত জার্মানি, ফ্রান্স ও ইটালিসহ পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রকে নিয়ে। খুব কৌশলে তারা এক রাজাকে অন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দিত। ভয় ও কুসংস্কারের জাঁতাকলে কাবু করে রাখত প্রতিটি জাতিকে।

তবে এটা ঠিক যে, ব্যক্তি হিসেবে কিছু সৎ ও পরোপকারী ইহুদি সব যুগেই খুঁজে পাওয়া যাবে। শান্তির বাণী প্রচার করাই যে ইজরাইলের একমাত্র উদ্দেশ্য, এমন চেতনা কেবল তারাই লালন করে। তারপরও জাতিগতভাবে তাদের ওপর সাধারণ মানুষের যে বিদ্বেষ, তা কখনো বন্ধ হয়নি। তাদের নিয়ে একটি প্রবাদ আছে–

> 'ইজরাইল অনেকটা আঙুর গাছের মতো; তার শাখা-প্রশাখা যতই কাটা হোক না কেন, তা আবারও গজাবে। কারণ, তার শেকড় রয়েছে মাটির অনেক গভীরে।'

আজকের যে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক, তার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। জার্মান ইহুদি পরিবার রথসচাইল্ড হলো এই শিল্পের কান্ডারি। ইংল্যান্ড, ইটালি, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়াসহ আরও অনেক দেশে তাদের শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যখনই কোনো রাজার অর্থের প্রয়োজন হতো, তারা এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরবরাহ করত। আবার যদি কোনো রাজা মূল্যবান সম্পদ (স্বর্ণ, রৌপ্য, কপার ইত্যাদি) ব্যবহার না করে বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে চাইত, তবে ব্যাংকারগণ চেকের মতো ছোট্ট একটি কাগজের টুকরো স্বাক্ষর করে সেই দেশের শাখায় পাঠিয়ে দিত। এই

কাগজের টুকরো আজকের দিনে ব্যাংক চেক-এ রূপ নিয়েছে। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম যে সামরিক বহিনী গঠিত হয়, তাতেও ছিল ইহুদিদের মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ।

বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক অফিস স্থাপনের ধারণা সর্বপ্রথম তাদের মাথা থেকেই উদ্ভাবিত হয়। ফলে ইউরোপের দেশগুলোতে যখন নতুন কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা দেখা দিত, প্রথম তারাই সে খবর পেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'Peaceful Penetration' নামে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার দরুন আমেরিকার বাজার জার্মানদের জন্য উন্মুক্ত হয়। এতে করে সে দেশের সাধারণ জনগণ লাভবান হয়েছে তা নয়। কারণ, পুরো ঘটনার আড়ালে ছিল সেখানকার ইহুদিরা। তারা জার্মানির নাগরিকত্বকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আমেরিকায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে। সিন্ডিকেট উপায়ে প্রতিটি শিল্পের ওপর থাবা বসাতে শুরু করে। ফলে অনেক ব্যবসায়ী নিরূপায় হয়ে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে আমেরিকা জার্মানি হতে প্রচুর তুলা আমদানি করে। আরও অনেক তুলা রপ্তানির জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ শুরুর পর তা আর রপ্তানি করা সম্ভব হয়নি। মালিক সমিতি এত তুলা নিয়ে কী করবে? সব তো নষ্ট হয়ে যাবে! ফলে তারা বাধ্য হয় তুলা নিলামে ওঠাতে। এ সময় লন্ডনে থাকা ইহুদিরা সেই পাহাড় পরিমাণ তুলা নিলামের ভিত্তিতে কিনে নেয়। তারা যে মূল্যে তুলা ক্রয় করে, তা ছিল আমেরিকান বাজারমূল্য থেকে অনেক কম। এর উদ্দেশ্য ছিল বাজারে তুলার দাম কমিয়ে আনা। ফলাফল তাই হলো; রাতারাতি তুলার দাম কমতে শুরু করে। এই সুযোগে তারা আরও অনেক তুলা কিনে বাজারকে তুলাশূন্য করে। বাজার খালি হওয়ার পর তারাই আবার তুলার দাম বাড়াতে শুরু করে। কারণ, বাজারে তুলার ছিটেফোঁটা পর্যন্ত ছিল না। তারা প্রচার করে– বাজারে তুলার খুবই অভাব, তাই তুলাজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে বিশ্বযুদ্ধে তারা প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে যায়।

বিশ্ব অর্থব্যবস্থার বর্তমান প্রেক্ষাপট কতটা কঠিন রূপ নিয়েছে, তা সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। নির্দয় পুঁজিবাজার কখনো শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে পারেনি। শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহলগুলো সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। পুঁজিকে কুক্ষিগত করে স্বার্থান্বেষী মহল কুলি-মজুরদের পারিশ্রমিক পানির দরে নামিয়ে এনেছে। পুঁজিবাজার হলো শ্রমবাজারের ছাদস্বরূপ, কিন্তু এই ছাদ কখনো শ্রমজীবী মানুষের নিরাপদ আশ্রয় হতে পারেনি।

পুঁজি বলতে আমরা মূলত অর্থকে বুঝি, যা উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়। আমরা ভুলবশত উৎপাদক গোষ্ঠী, ব্যবসায়িক ম্যানেজার ও চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাদ বলে থাকি। কিন্তু কীভাবে তাদের পুঁজিবাদ বলব, যখন তাদের ব্যবসায়িক পুঁজির জোগানদাতা অন্য কোনো বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী! মূলত এই বিনিয়োগকারীদের চাপে পড়ে উৎপাদক, ম্যানেজার এবং চাকরি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বভাবগত ভালো রূপ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। পায়ের নিচে মাটি ধরে রাখতে এবং বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ মেটাতে তারা শ্রমবাজারের ওপর

কঠিন রূপ ধারণ করে। ফলে পুঁজিবাজার ও শ্রমবাজারের মধ্যে সব সময় বিরোধ লেগে থাকে। এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ কখনোই সম্ভব নয়; যতদিন না বিশ্ব অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ এই স্বার্থান্বেষী মহল থেকে ছিনিয়ে আনা যাবে।

আজ পুরো পৃথিবী এমন কয়েকটি ভয়ংকর মতবাদে পরিচালিত হচ্ছে, যার অধিকাংশই আমাদের অজানা। যেমন : 'সুপার ক্যাপিটালিজম'– যেখানে বলা হয় 'স্বর্ণই প্রকৃত সম্পদ'। 'সুপার গভর্নমেন্ট' একটি পৃথক ও স্বাধীন সরকারব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার প্রতিষ্ঠা করা। যতদিন না এই ভয়ংকর মতবাদ দুটোর অবসান ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত পুঁজিবাজার ও শ্রমবাজারের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে।

আমেরিকা আবিষ্কার

ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, আমেরিকা আবিষ্কার করেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তবে এটা শেখায়নি, তিনি কাদের সহযোগিতায় এ দেশের সন্ধান পান।

আজ অবধি যে সকল ঐতিহাসিক সমুদ্র অভিযান মানুষকে নতুন সব জ্ঞান ও প্রাচুর্যতা এনে দিয়েছে, তার অর্ধেক সম্ভব হয়েছে কেবল ইহুদিদের জন্য। যাযাবর জাতি হওয়ায় ইহুদিদের একটি বিশেষ সুবিধা হলো– পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কোথায় কী আছে, তা তারা খুব ভালো করেই জানে। তা ছাড়া সমুদ্রযাত্রায় মানুষ যেসব যন্ত্রপাতি বহুকাল ধরে ব্যবহার করেছে, তার অধিকাংশই ইহুদিদের আবিষ্কার। যেমন : ম্যাপ, কম্পাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি। এ কারণে সমুদ্র অভিযান পরিচালনা করার ক্ষেত্রে তাদের মতো দক্ষতা আর কোনো জাতির ছিল না। এ জন্য প্রতিটি দেশের নৌবিভাগে তাদের আলাদা কদর ছিল।

১৪৯২ সালের ২ আগস্ট ইহুদিদের তিন লাখ অধিবাসীকে স্পেন থেকে নির্বাসিত করা হয়। ঠিক তার পরদিন ৩ আগস্ট কলম্বাস তাদের মধ্যে একদল নাবিককে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমসমুদ্র পথে বেরিয়ে পড়েন। বিশেষ এই জাতিগোষ্ঠীর সাথে সখ্যতার কথা কলম্বাস বহুবার নিজ মুখে স্বীকার করেছেন। নিজের নতুন সব অভিযান পরিকল্পনা এবং আবিষ্কারের কথা প্রথমে তিনি এ দলকে জানাতেন।

ছোটোকাল থেকেই শুনে আসছি, সমুদ্র অভিযানের প্রতি কলম্বাসের এতটা আগ্রহ দেখে রানি ইসাবেলা নিজের বহু স্বর্ণালংকার তাকে দান করে দিয়েছিলেন। সেই দানের অর্থে নির্মিত হয় জাহাজ, ক্রয় করা হয় প্রয়োজনীয় সব রসদপত্র। তবে এই দান যে তিনি এমনি এমনি করেননি, সেই তথ্য সহজে কোথাও উল্লেখ করা হয় না।

তৎকালীন স্পেন সাম্রাজ্যে রানি ইসাবেলার ঘনিষ্ঠ তিনজন ইহুদি উপদেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা হলেন– ভ্যালেন্সিয়ার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী এবং রয়েল টেক্সাসের ইজারাদার Luis de

Santagel, স্পেনের সরকারি কোষাধ্যক্ষ Gabriel Sanchez এবং রয়েল চ্যাম্বারলিনের সদস্য Juan Cabrero। মানুষের কল্পনাশক্তি কীভাবে প্রভাবিত করতে হয়, সেই জ্ঞান তাদের খুব ভালো করেই ছিল।

সে সময় স্পেনের অর্থনীতিতে খুব বাজে সময় যাচ্ছিল। বাণিজ্যে হিমশিম খাচ্ছিল বলে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সম্পদের পরিমাণ কমতে থাকে। বিভিন্ন দেশ থেকে ধার-দেনা করে তাদের খাদ্য ক্রয় করতে হচ্ছিল। অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। সেকালে মানুষের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তারা বিশ্বাস করত, নতুন কোনো ভূমি খুঁজে পেলে হয়তো গুপ্তধন পাওয়া যাবে। মূলত এটি ছিল ইহুদিদের দীর্ঘকালীন প্রোপাগান্ডার[১৪] ফল। তারা সুকৌশলে রানির মগজেও এ বিশ্বাসটি ঢুকিয়ে দেয়। তিনি ভাবেন, সত্যি যদি কলম্বাস নতুন কোনো ভূমি খুঁজে পায়, তবে অবশ্যই সেখানে অনেক ধন-সম্পদ পাবে; যা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। তাই নিজের বহু স্বর্ণালংকার বন্ধক রেখে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করেন। Luis de Santagel অভিযান শুরুর আগেই রানির নিকট অর্থের আবেদন করেন। তাকে ১৭,০০০ ইউরোপিয়ান স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয় (১৯২৩ সালের ১,৬০,০০০ ডলার মূল্যের সমান), যা সম্পূর্ণ অভিযানের খরচের চেয়েও অনেক বেশি।

কলম্বাসের সঙ্গী হিসেবে জাহাজে ছিল উচ্চপদস্থ পাঁচজন ইহুদি নাবিক। তাদের পরিচয়– দোভাষী Luis de Torres, শল্য চিকিৎসক Marco, চিকিৎসক Bernal, Alonzo de la Calle ও Gabriel Sanchez। অভিযানের মাঝপথে Luis de Torres কিউবাতে নামেন। সেখানে তিনি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তামাক চাষ শুরু করেন, আর রাতারাতি বনে যান তামাক শিল্পের সম্রাট।

Luis de Santagel ও Gabriel Sanchez এই অভিযানের ছুতোয় রানির কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নেয়, কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের পর তারাই আবার কলম্বাসকে ষড়যন্ত্রের জালে আটকে ফেলে। Bernal এই কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উপদেষ্টাদের কথায় শেষ পর্যন্ত রানিও ক্ষেপে ওঠেন। কারণ যে কল্পিত গুপ্তধনের লোভে তাকে আমেরিকা পাঠানো হয়েছিল, বাস্তবে তার কিছুই পাওয়া যায়নি। উলটো পুরো অভিযান আর্থিক ক্ষতির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তা ছাড়া রেড-ইন্ডিয়ানদের সাথে তাদের যুদ্ধ তখন চরমে। শেষমেষ এই বিখ্যাত নাবিকের স্থান হয় জেলখানায়।

---

[১৪]. প্রোপাগান্ডা–কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা অবস্থানের দিকে জনমত তৈরির উদ্দেশ্য বা অবস্থানের দিকে জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে এমন সব বিষয় প্রচার করা, যাতে সাধারণ জনগণের ধ্যানধারণা ওই একটি দিকে পরিচালিত হয়।

এবার তারা ভাগ্যের সন্ধানে আমেরিকাকে নিয়ে পরিকল্পনা আঁটা শুরু করে। মূলত ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রিকার কোথাও দীর্ঘদিন থাকার সুযোগ পাচ্ছিল না; কিছুদিন পরপরই তাদের বিভিন্ন দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছিল। তাই তারা এমন একটি ভূমির সন্ধান করছিল, যেখান থেকে আর বের হতে হবে না। জেরুজালেম পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তা-ই হবে তাদের নিরাপদ আবাসভূমি।

শুরুতে তারা দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করে, কিন্তু সে সময় ব্রাজিলের সাথে ডাচদের সামরিক রেষারেষী চলছিল বলে তারা পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনে। পরে তারা ডাচদেরই একটি উপনিবেশের দিকে যাত্রা করে, যা আজ নিউইয়র্ক নামে পরিচিত। কিন্তু ডাচ গভর্নর Peter Stuyvesant এই অভিবাসী গোষ্ঠীকে সেখানে থাকার অনুমতি দেননি। তিনি তাদের দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা আগে থেকেই নিজেদের সুরক্ষা বলয় তৈরি করে রেখেছিল। ফলে অভ্যর্থনা না জানালেও গভর্নর সাহেব তাদের একেবারে ফেলে দিতে পারলেন না। কিছু শর্তের বিনিময়ে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন। শর্তগুলো ছিল–

১. ডাচ কোম্পানিগুলোতে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে।
২. সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. পাইকারি শিল্পসহ সকল ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে।

সামান্য সুযোগ পেলে তারা কী করতে পারে, তা তিনি ভালো করেই জানতেন। তাদের কোনোভাবে আটকে রাখা যায় না। একদিকে আটকে রাখলে অন্য দিকে ঠিকই উপায় বের করে নেয়।

যখন ইহুদিদের নতুন কাপড়ের বাণিজ্যে একঘরে করা হলো, তখন তারা পুরাতন কাপড় সংগ্রহ করে বিক্রি করা শুরু করল। মুহূর্তেই পুরাতন কাপড়ের বাণিজ্যে হইচই পড়ে গেল। এমন কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। এটা কী করে সম্ভব! ইহুদিদের পণ্য বাণিজ্যে নিষিদ্ধ করা হলে– তারা ফেলে দেওয়া নষ্ট পণ্যকে কাজে লাগিয়ে ব্যাবসা করতে শুরু করে। পৃথিবীতে তারাই প্রথম জাতি, যারা ফেলে দেওয়া নষ্ট পণ্যের বাণিজ্য করেছে।

ইহুদিরাই প্রথম সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মালামাল উদ্ধারের (Salvage) ধারণা জন্ম দিয়েছে; বিষয়টি অনেকটা গুপ্তধনের মতো। তারাই শিখিয়েছে– কীভাবে পুরাতন কাপড় ব্যবহার করতে হয়, কীভাবে পুরাতন পালক পরিষ্কার করতে হয় এবং কীভাবে কাজুবাদাম ও খরগোসের চামড়া ব্যবহার করতে হয়। পশমি শিল্পে তাদের আগ্রহ সব সময়ই অনন্য পর্যায়ের ছিল। বর্তমানেও এই শিল্প ইহুদিরাই নিয়ন্ত্রণ করছে। পশমি পণ্য উৎপাদনকারী যেসব বড়ো বড়ো ব্রান্ড ও কোম্পানির নাম সচরাচর শোনা যায়, তাদের সিংহভাগ শেয়ার-ই এই বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর। যেকোনো প্রতিকূল প্ররিস্থিতি কীভাবে নিজেদের আওতায় আনতে হয়, তা ইহুদিদের চেয়ে ভালো আর কেউ দেখাতে পারবে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও Mr. Stuyvesant একসময় তাদের নিউইয়র্ক বন্দর ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতে বাধ্য হন। তাদের চোখে এই অঞ্চলটি ছিল মর্তের স্বর্গ। তারা দলবেধে সেখানে পাড়ি জমাতে শুরু করে। এভাবে নিউইয়র্ক হয়ে উঠে তাদের সর্বাধিক জনবসতির শহর এবং আমেরিকার প্রধান আমদানি ও রপ্তানিবন্দর। কোনো ব্যবসায়ী এ বন্দর ব্যবহার করতে চাইলে তাকে বন্দর মালিকদের কর (Tax) দিতে হতো। যেহেতু এই শহর তাদের প্রচুর ধন-সম্পদ এনে দিয়েছে, তাই তারা গর্ব করে বলত– হয়তো তাদের ধর্মে এ ভূমি সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল, আর এটাই হলো নিউ জেরুজালেম। যতদিন না তারা প্রকৃত জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত এখানেই থাকবে।

George Washington-এর শাসনামলে আমেরিকায় তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০০, কিন্তু এদের সবাই ছিল সচ্ছল ব্যবসায়ী। আমেরিকা যেন ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পায়, সে জন্য Haym Saloman (একজন ইহুদি ব্যবসায়ী) তার সকল সম্পদ স্বাধীনতাযুদ্ধে বিনিয়োগ করে। বিনিময়ে আমেরিকান সরকার তাকে এবং তার জাতিগোষ্ঠীকে অবাধে বাণিজ্য করার লাইসেন্স দেয়। ফলে মুনাফা উপার্জনের পথে তাদের আর কোনো বাধাই থাকল না।

তাদের নিকট সম্পদ ও ব্যক্তিসত্তা দুটি আলাদা বিষয়। কেউ বিপদে পড়লে তারা অবশ্যই সহানুভূতি জানাবে, কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করার ঘটনা খুবই কম।

মনে করুন, নিজের ভিটে বাড়ি বন্ধক রেখে আপনি তাদের কাছ থেকে কিছু ঋণ নিলেন এবং ব্যাবসার জন্য পণ্য কিনলেন, কিন্তু গুদামঘরে আগুন লেগে সব পণ্য পুড়ে গেল। পরিবার নিয়ে আপনার এখন পথে বসার অবস্থা। এমতাবস্থায় আপনি ঠিকই তাদের সহানুভূতি পাবেন, কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে আপনার ভিটে-বাড়ির দাবি ছেড়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তাদের চোখে It was only Business; তবে ব্যতিক্রমী কিছু উদাহরণ থাকতেই পারে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জার্মানিতে যে সুইটশপ[১৫] প্রতিষ্ঠা পায়, তা বহু আগেই নিউইয়র্কের অলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। আজকের দিনে সুইটশপকে তো সমাজব্যবস্থার অংশই বলা যায়। সবার ওপর প্রভুত্ব কায়েমের যে মনোভাব তারা যুগ যুগ ধরে লালন করে এসেছে, তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের শ্রমবাজার। তারা যা চেয়েছে তাই হয়েছে। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় বলতে এখন আর কিছুই নেই। কারণ, এসব শিল্প-কারখানায় তারা যা-ই তৈরি করে, তা-ই আমাদের ক্রয় করতে হচ্ছে। তাদের পারিশ্রমিকের ওপর মুনাফা যোগ করে যখন বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন সাধারণ মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাই এত সব কর্মসংস্থান করেও মানুষের আহার-বস্ত্র নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

---

[১৫]. সুইটশপ–যেখানে নামমাত্র পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমিকদের দিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি করিয়ে নেওয়া হয়।

ইহুদিদের মনে দেশপ্রেমের কোনো বালাই নেই। নাগরিকত্ব বিষয়টি তাদের কাছে মুনাফা উপার্জনের হাতিয়ার। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সবাই বিশ্বাস করে আমেরিকা হলো খ্রিষ্টানদের দেশ। এ দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সবকিছু তারা-ই পরিচালনা করছে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে থাকা কোনো খ্রিষ্টান এ দেশের পণ্য হাতে পেয়ে এই ভেবে খুশি হয়– এটা হয়তো তার-ই কোনো ধর্মীয় ভাই তৈরি করেছে। কিন্তু ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এ দেশের নাম করা প্রায় সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকই ইহুদি। জ্যান্টাইলদের কিছু শেয়ার থাকলেও তা পরিমাণে অনেক কম। প্রতিষ্ঠানের উঁচু পদগুলো তো ইহুদিদের জন্যই বরাদ্দ রাখা হয়! কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে ব্যাবসা পরিচালিত হবে এবং কীভাবে মুনাফা বণ্টন করা হবে, তার সবই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করে। 'American Importing Company' অথবা 'American Commercial Company' নামগুলো ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো– আমেরিকার সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে না পারে এগুলো ইহুদিদের প্রতিষ্ঠান। যেসব শিল্পে তারা ইতোমধ্যেই একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো–

- চলচ্চিত্রশিল্প
- থিয়েটারশিল্প
- চিনিশিল্প
- তামাকশিল্প
- মাংসশিল্পের ৫০ ভাগ
- জুতাশিল্পের ৬০ ভাগ
- পোশাকশিল্প
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রশিল্প
- অলংকারশিল্প
- খাদ্যশস্য
- বর্তমানে তুলাশিল্প
- কলরাডো অঙ্গরাজ্যের ধাতু বিগলনশিল্প
- ম্যাগাজিন প্রকাশনী
- খবর প্রকাশনী
- তরল পানীয়শিল্প
- ঋণ ব্যবসায়

আজ তাদের যে সাফল্য, তা অগ্রাহ্য করার বিষয় নয়। তাদের পন্থা অনুসরণ করে যে কেউ-ই সম্পদশালী হতে পারবে। যেমন : বাজারে পণ্যের মূল্য বাড়ানো, পণ্যকে ব্যবসায়ের মূলনীতি

হিসেবে গ্রহণ করা, সুদের বিনিময়ে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু জ্যান্টাইলদের পক্ষে এসব কাজ গুছিয়ে করা অসম্ভব।

কেবল কৃষি কাজে ইহুদিরা কখনো সফল হতে পারেনি। কারণ, ইহুদিরা কায়িক শ্রম একদম-ই করতে পারে না। তারা হলো পরজীবী; বেঁচে থাকে অন্যের জীবিকা ভোগ করে। সারা বছর পরিশ্রম করে একজন কৃষক যে ফসল ফলাবে, তা তারা কেড়ে নিয়ে বাণিজ্য করবে। এ পর্যন্ত তারা বহুবার পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে কৃষি উপনিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছে এবং প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। তবে দুগ্ধ ও পশু পালন শিল্পে তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

আসলে মাটির সাথে তাদের সম্পর্ক কখনোই ভালো ছিল না। তারা জন্মেছে শুধু বাণিজ্য করার জন্যই। এই ছোট্ট বিষয়টি-ই পরিষ্কার করে দেয়, কেন প্যালেস্টাইন নিয়ে তাদের এমন ব্যাকুলতা! প্যালেস্টাইনকে বলা হয় প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের বাণিজ্যিক দ্বার। এই ভূমিকে নিজেদের করে নেওয়ার অর্থ হলো এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা ও মেডিট্যারিয়ান সাগরের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা।